স্বপ্নের রেলগাড়ি

ইমদাদুল হক মিলন

তি মাস্টার বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন।

কান্নার শব্দে চারপাশের ঘরবাড়ি থেকে ছুটে এলো মানুষ। অবাক বিস্ময়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। মতি মাস্টারের মতো মানুষ কাঁদছেন? ব্যাপার কী?

কেউ কেউ প্রশ্ন করে। কী হয়েছে মাস্টার সাহেব? কাঁদছেন কেন?

মতি মাস্টার কথা বলেন না। উঠোনে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ান আর কাঁদেন। পড়শিরা কিছুই বুঝতে পারে না। মতি মাস্টার দৃঢ় মানোবলের মানুষ। গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার। তাঁকে কেউ কখনও কাতর হতে দেখেনি, চোখের পানি ফেলতে দেখেনি। একমাত্র ছেলেটিকে ছোট রেখে স্ত্রী মারা গেছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর দিনও কাঁদেননি তিনি। আর বিয়েও করেননি। মা এবং বাবার আদরে বড় করেছেন ছেলেকে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠিয়েছেন। এক দুবছরের মধ্যে পড়াশুনা শেষ করে কর্মজীবনে ঢুকবে ছেলে। জীবনের প্রধান দায়িত্ব শেষ হবে মতি মাস্টারের।

সেই মানুষ এইভাবে কাঁদছেন?

'৭১ সালের কথা। আজকের বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্-ান। পাকিস্-ান দেশটি ছিল দুভাগে বিভক্ত। পূর্ব পাকিস্-ান, পশ্চিম পাকিস্-ান। পশ্চিম পাকিস্-ানীদের ভাষা উর্দু, পূর্ব পাকিস্-ানের ভাষা বাংলা। '৪৭ সালে বৃটিশদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুটো রাষ্ট্র হয়েছিল। ভারত, পাকিস্-ান। সেই তখন থেকেই পশ্চিম পাকিস্-ানীরা নানা রকম অত্যাচার শুরু করেছিল পূর্ব পাকিস্-ানীদের ওপর, অর্থাৎ বাঙালিদের ওপর। পূর্ব পাকিস্-ানের প্রায় সর্বস্ব তারা পশ্চিম পাকিস্-ানে নিয়ে যেত। অর্থনৈতিকভাবে অঞ্চলটিকে পর্যুদস্- করে দিচ্ছিল। শিক্ষা দীক্ষায় বা অন্যকোনও ক্ষেত্রেই বাঙালিকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছিল না। এই অবস্থায় '৫২ সালে বাঙালির ভাষাটিকেও তারা কেড়ে নিতে চাইলো। দুই পাকিস্-ান মিলে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু পাকিস্-ানী শাসকরা চাইলো উর্দু হবে পাকিস্-ানের রাষ্ট্রভাষা। বাঙালি এটা মেনে নিল না। ভাষা রক্ষার জন্য তার শুরু করলো আন্দোলন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায় মিছিল বের করলো। '৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্-ানীরা গুলি চালালো মিছিলরত ছাত্রজনতার ওপর। সালাম রফিক জব্বার বরকত নামে চারজন বাঙালি শহীদ হলেন ভাষার জন্য যুদ্ধ করে। শেষপর্যন্- পাকিস্-ানীরা বাধ্য হলো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে। বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসটিকে তাই বলা হয় 'ভাষার মাস', ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখটিকে বলা হয় 'ভাষা দিবস'। গত কয়েক বছর আগে এই দিবসটি পেয়েছে 'আন্-র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর স্বীকৃতি। পৃথিবীর বহু দেশে এই দিবসটি এখন অত্যন্- শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। বুকের রক্ত দিয়ে ভাষা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বাঙালি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও জাতির নেই। ভাষা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায়। ২১ শে ফেব্রুয়ারির সকালবেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শহীদ মিনারে যায় ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে। কণ্ঠে থাকে তাদের এক অবিস্মরণীয় গান 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'। দেশের প্রতিটি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আছে শহীদ মিনার।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার পরও কিন্তু বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ণ বন্ধ করলো না পাকিস্-ানীরা, নানা রকমভাবে চালিয়ে যেতে লাগল। দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে লাগল বাঙালি। আর্থিক দারিদ্র্যের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে সাংস্কৃতিক দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়া হতে লাগল তাদেরকে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ হলো পূর্ব পাকিস্-ানে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি এসব মেনে নিল না। পাকিস্-ান বিরোধী একটা মনোভাব দিনকে দিন জোরালো হতে লাগল। '৬৯ সালে তখনকার পাকিস্-ানী শাসক আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হলো বাংলাদেশে। '৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের দল আওয়ামী লীগ ২০০ আসনের মধ্যে ১৯৭ টি পেল, তারপরও ক্ষমতায় যেতে দেয়া হলো না তাঁকে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি শুরু করলো অসহযোগ আন্দোলন। ৭ মার্চ রমনা রেসকোর্সে ভাষণ দিলেন বঙ্গবন্ধু 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তখন পাকিস্-ানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। তার বুদ্ধিদাতা বেনজির ভুট্টোর বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টো। পশ্চিম পাকিস্-ান থেকে জাহাজ ভরে, পেন ভরে হাজার হাজার সৈন্য আসতে লাগল পূর্ব পাকিস্-ানে। '৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে রাতের অন্ধকারে সেইসব সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢাকা শহরের নিরীহ ঘুমন্- মানুষের ওপর। হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলল তারা। ছাত্রাবাসগুলো উজাড় করে ফেলল, ছাত্রীদেরকে ধরে নিয়ে গেল, রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাক তছনছ করলো, বাঙালি সৈনিকদের বন্দী করলো, হত্যা করলো। বঙ্গবন্ধুকেও বন্দী করলো। সে এক ভয়ঙ্কর দিন। বাঙালি জাতির জীবনে ওরকম দিন কখনও আসেনি।

পরদিন ২৬ মার্চ বিকেলবেলা চট্টগ্রাম জেলার কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন মেজর জিয়াউর রহমান।

শুরু হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার যুদ্ধ।

পাকিস্-ান আর্মি তখন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। শহর তচনচ করে গ্রামকে গ্রাম পোড়াতে শুরু করেছে। নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে অসহায় মানুষের ওপর। প্রাণের ভয়ে মানুষ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গ্রামে। সেখানেও ঢুকে যাচ্ছে পাকিস্-ান আর্মির জন্তুগুলো। বাঙালিদেরকে রক্ষা করার জন্য বর্ডার খুলে দিল ভারত। প্রাণ বাঁচাতে আগরতলা এবং পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে গেল এককোটি বাঙালি। বাংলার ছাত্রজনতা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াল ভারত। পাকিস্-ানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল বীর বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শুরু হলো আগরতলায়, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহয্য করল ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্রহাতে বাংলাদেশে ঢুকতে লাগল মুক্তিযোদ্ধারা। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ শুরু করল, নিজেরা জীবন দিতে লাগল, পাখির মতন গুলি করে মারতে লাগল পাকিস্-ানী সৈনিকদেরকে।

মতি মাস্টারের ছেলেটি গিয়েছে এই যুদ্ধে। আগরতলায় ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে। ঢাকার কাছাকাছি একটা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে, যাতে ওই ব্রিজ ব্যবহার করে গ্রাম এলাকায় ঢুকে সাধারণ মানুষদেরকে হত্যা করতে না পারে পাকিস্-ানীরা। ব্রিজের দুপাশে পাহারায় থাকা পাকিস্-ানীদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হলো। সবকটা পাকিস্-ানীকেই শেষ করলো ওরা। মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হলো তিনজন। তার মধ্যে একজন মতি মাস্টারের ছেলে। গ্রামে বসে আজ সেই সংবাদ পেয়েছেন মতি মাস্টার। তারপর থেকেই বুক চাপড়ে কাঁদছেন।

ঘটনা শুনে পড়শিরা স্-ব্ধ হয়ে গেছে, নিঃশব্দে চোখের পানিও ফেলছে কেউ কেউ। আহা মতি মাস্টারের একমাত্র ছেলে! মা হারা ছেলেটিকে এত কষ্টে মানুষ করেছিলেন তিনি! এক দুবছর পর কর্মজীবনে ঢুকবে যে ছেলে, বিয়েশাদি করে সংসারী হবে, বাবার এতদিনকার কষ্ট লাঘব করবে, সেই ছেলে এইভাবে মারা গেল?

পড়শিদের সহানুভূতির কথা শুনে, কান্নাকাটি দেখে চোখের পানি মুছতে মুছতে তাদের দিকে তাকালেন মতি মাস্টার। তোমরা আমার কান্নার অর্থটা বোধ হয় বুঝতে পারনি। আমার ছেলে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হয়েছে, আমি এই দুঃখে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এই ভেবে, কেন আলাহ আমাকে আরও কয়েকটি ছেলে দেননি! আমার যদি আরও কয়েকটি ছেলে থাকতো, আমি তাদের প্রত্যেককে মুক্তিযুদ্ধে পাঠাতাম। তারা প্রত্যেকে দেশের জন্য প্রাণ দিলে পিতা হিসেবে আমি সার্থক হতাম। আমার জীবন ধন্য হতো।

ট্রেনের জানালা দিয়ে সবুজ বাংলাদেশ দেখতে দেখতে সেই মহান পিতার কথা আমার মনে পড়ে। এরকম কত পিতা তাঁর সন্-ান হারিয়েছেন, কত মায়ের বুক খালি হয়েছে। ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ প্রাণ হারাতে হয়েছে আমাদেরকে। বাংলার মাঠেঘাটে ছড়িয়ে আছে কত মানুষের বুকের রক্ত, কত হাহাকার নির্যাতনের ইতিহাস। কত গৌরবগাথা, কত হৃদয়ের উত্তাপ, কত বেদনার কাহিনী। চোখের জলে লেখা হয়ে আছে সেইসব মানুষের কথা।

মুক্তির মন্দির সোপনতলে কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে।

ট্রেনের নাম 'মৈত্রী এক্সপ্রেস'। ৪৩ বছর পর ভারত বাংলাদেশ ট্রেন যোগাযোগ শুরু হলো। ঢাকা থেকে সরাসরি কোলকাতা, কোলকাতা থেকে ঢাকা। '৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার পরও ট্রেন যোগাযোগটা ছিল। বন্ধ হয়ে গেল '৬৫ সালে। সেবছর ভারত পাকিস্-ান একটা যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর সব যোগাযোগই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় বই পত্র পত্রিকা, সিনেমা সবই তার আগে পূর্ব পাকিস্-ানে আসতো।

ভারতের সঙ্গে পাকিস্-ানের সম্পর্ক চিরকালই খারাপ। দেশভাগ হয়েছিল অনেকটাই ধর্মের ভিত্তিতে। পাকিস্-ান মুসলমানদের দেশ, ভারত হিন্দুদের। এই মনোভাবের কারণে দেশভাগের আগের বছর ভয়ানক রায়ট হয় হিন্দু মুসলমানে। আর দেশভাগের সময় পূর্ববাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু তাদের আজন্মের ভূমি ছেড়ে চলে যায় পশ্চিম বাংলায়, পশ্চিম বাংলা থেকে একইভাবে মুসলমানরা চলে আসে পূর্ববাংলায়। সে এক বিশাল মানবিক বিপর্যয়।

’৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শেষ পর্যন্- পাকিস্-ানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলো ভারত। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ৯৭ হাজার পাকিস্-ানী সৈনিককে সারেন্ডার করালো, জন্ম নিলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্-ানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। তাঁকে নিয়ে অসাধারণ দুটো লাইন লিখলেন অন্নদাশংকর রায়।

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরি বহমান
ততোদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীনতার পর ৩৭ বছর কেটে গেল কিন্তু একদা পূর্ববাংলা পশ্চিমবাংলার মধ্যে যে আত্মিক টান, যোগাযোগ ছিল তা আর আগের পর্যায়ে ফিরে গেল না। সেই যে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টিমারে চড়ে বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরী মেঘনা পদ্মা পাড়ি দিয়ে পূর্ববাংলার মানুষ গিয়ে নামতো গোয়ালন্দ ঘাটে, সেখান থেকে ধোয়া ওঠা গরম ভাত আর পদ্মার রূপালি ইলিশ ভাজা খেয়ে ট্রেনে চড়তো। সেই ট্রেনে সরাসরি কলকাতার শিয়ালদা স্টেশান। ’৬৫ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রেল যোগাযোগটা আর চালুই হচ্ছিল না। বাস যোগাযোগ হয়েছে কয়েকবছর আগে, রেলটা হচ্ছিল না।

এবার হলো। ১ বৈশাখ ১৪১৫ দুদেশের মধ্যে ৪৩ বছর পর আবার শুরু হলো রেল যোগাযোগ। পয়লা বৈশাখ বাঙালি জাতির প্রাণের উৎসবের দিন। ধর্মীয়ভাবে আমরা কেউ মুসলমান কেউ হিন্দু কিন্তু জাতি হিসেবে বাঙালি। মনে রাখতে হবে জাতি এবং ধর্ম এক নয়। এই মহান সত্য উপলব্ধি করা যায় পয়লা বৈশাখের দিন। সেদিন দুইবাংলার মানুষই মেতে ওঠে বাংলা নববর্ষবরণ উৎসবে। ঢাকার রাস্-ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। ‘ছায়ানট’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান রমনার বটমূলে ভোরবেলা অনুষ্ঠান করে, গান গেয়ে নতুন বছরকে বরণ করে। সেই অনুষ্ঠানে আগে দুচারহাজার লোক হতো। গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ লক্ষ লোক হয়। মানুষের চাপে ওই এলাকায় সেই সকালে চলাফেরা করা যায় না। কয়েক বছর আগে এখানে একবার বোমা হামলা হয়েছিল, প্রাণ হারিয়েছিলেন কয়েকজন বাঙালি, তবু মানুষ দমেনি। দিনকে দিন মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ছে ছায়ানটের অনুষ্ঠানে।

বহুবছর পর এবার ছায়ানটের অনুষ্ঠানে যাওয়া হলো না। মৈত্রী এক্সপ্রেস আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কোলকাতায়। সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকার ক্যান্টনম্যান্ট স্টেশন থেকে ট্রেন। আমি যাচ্ছি ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র আমন্ত্রণে। বাংলাদেশ থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে আনন্দবাজার, কোলকাতা থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে। ট্রেনে যেতে যেতে, ট্রেনে বসেই আমি লিখবো আমার ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশে আসতে আসতে শীর্ষেন্দু লিখবেন তাঁর অভিজ্ঞতা। দুটো লেখাই পরদিন ছাপা হবে আনন্দবাজারে, ফার্স্ট পেজে।

মৈত্রী এক্সপ্রেস খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে! ফুলে ফুলে ছেঁয়ে আছে ট্রেন। মাথায় পত পত করছে বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা। স্টেশনে বিশাল উৎসব। একদল বাউল ঘুরে ঘুরে গান গাইছে, সুন্দর শাড়ি পরা মেয়েরা রজনীগন্ধার স্টিক উপহার দিচ্ছে প্রত্যেক যাত্রীকে। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। দুদেশের উচ্চপদস্- সরকারি কর্মকর্তারা আছেন, বিদেশী কুটনীতিকরা আছেন। স্টেশানের পাশে ভিড় করে আছে সাধারণ মানুষ। মৈত্রী এক্সপ্রেস দেখছে।

ট্রেন চলতে শুরু করলো, হাততালি দিতে লাগল সবাই, আনন্দ করতে লাগল। সারাটা পথ জুড়ে এই আনন্দ। মৈত্রী এক্সপ্রেস দেখে রেললাইনের দুপাশের বাড়িঘর থেকে ছুটে বেরুতে লাগল মানুষ। বাজারঘাট, দোকানপাট থেকে বেরুতে লাগল। শস্যের মাঠে কাজ করতে থাকা কৃষকরা উঠে দাঁড়াতে লাগল। পয়লা বৈশাখের মেলা বসেছে সবুজ ঘাসের মাঠে, সেই মেলায় হৈ চৈ আনন্দ শুরু হয়ে গেল ট্রেন দেখে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা লাফাচ্ছে, পাগলের মতো হাত নাড়ছে। এ যেন বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের ট্রেন। এক বাংলা থেকে আরেক বাংলায় যাচ্ছে বন্ধুত্বের গভীর গভীরতর বার্তা নিয়ে। মৈত্রী ট্রেনে তখন গান বাজছে,

'হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়
আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয়'।

এই গান শুনে আমার মনে পড়ছিল সুভাষের কথা। সুভাষ আচার্য। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা একসঙ্গে ঢাকার গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলে পড়তাম। কখন কোন ফাঁকে সুভাষ চলে গেল কোলকাতায়, আমি টেরই পেলাম না। এখনও সুভাষের সেই বালক মুখ আমার চোখ জুড়ে।
এই ট্রেন কি আমাকে সুভাষের কাছে নিয়ে যাচ্ছে?
ট্রেনের ভিতরেও চলছে আনন্দের ধুম। প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পঞ্চাশ ষাটজন সাংবাদিক বন্ধু যাচ্ছেন এই ট্রেনে। বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তাঁরা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন ঢাকায়। ট্রেন থেকে সরাসরি সংবাদ চলে যাচ্ছে টিভি পর্দায়। ঢাকা থেকে অবিরাম ফোন আসছে আমার। যাঁরা ফোন করছেন তাঁদের মধ্যেও গভীর আনন্দ।

আনন্দটা আমি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছি না। লেখার টেনশান। রাস্-াঘাটে আমি কখনও লিখতে পারি না। অনেকে পেনে কিংবা ট্রেনে বসে দিব্যি লিখতে পারেন, আমি পারি না। এমন কী কোথাও বেড়াতে গিয়েও লিখতে পারি না। শুধু মনে হয়, এলাম বেড়াতে, আনন্দ করতে, এখানে আবার কিসের লেখা!

আমাদের কামরায় আমরা পাঁচজন মানুষ। আমার মুখোমুখি বসেছেন মেজর জেনারেল হাফিজ সাহেব আর তাঁর স্ত্রী ইশিতা সারোয়াত। পাশে এক বয়স্ক দম্পতি। সঙ্গে তাঁর মেয়ে এবং ছোট্ট দু নাতী। ওরা বসেছে অন্য কামরায়। মেয়ে প্রায়ই এসে বাবা মাকে দেখে যাচ্ছে। বাবা অসুস্থ, বেশিক্ষণ হাঁটাচলা করতে পারেন না। তাঁর খাবার দাবারের তদারক করে যাচ্ছে মেয়ে। ভদ্রলোক স্মৃতিচারণ করতে পছন্দ করেন। অবিরাম কথা বলে যাচ্ছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রধান ব্যবধান তিনি প্রচুর কথা বলেন, স্ত্রী একদমই বলেন না। দুজনই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। ভদ্রলোক হাওড়া শিবপুরের, ভদ্রমহিলা চব্বিশ পরগনার আলীপুর এলাকার। দেশভাগের সময় পূর্ব পাকিস্-ানে চলে এসেছিলেন। ভদ্রলোক বললেন, '৬২ সালে শেষবারের মতো ট্রেনে করে কোলকাতা গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি এখনও মুগ্ধ করে তাঁকে। মেজর জেনারেল হাফিজের পূর্বপুরুষও পশ্চিমবঙ্গের। বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় তাঁদের বাড়ি। কাটোয়ার বাগানেপাড়ার বাড়িতে এখনও তাঁর ছোটচাচা থাকেন। নানাবাড়ি বীরভূমের শিউড়ি রামঘাটি। হাফিজ সাহেবের স্ত্রী ইশিতা সারোয়াত সাহিত্য অনুরাগী মানুষ। শ্বশুর তাঁর কাছে কাটোয়ার বাগানেপাড়ার বাড়ির অনেক গল্প করেছেন। তিনি যে ঘরে বসে বই পড়তেন সেই ঘরের কথা বহুবার বলেছেন বউমাকে। বউমার খুব শখ শ্বশুরের সেই পড়ার ঘরটি একবার দেখবেন। হাফিজ সাহেবও কোনওদিন সেই বাড়িতে যাননি। তাঁর বাবা পঞ্চাশ সালে চলে এসেছিলেন। হাফিজ সাহেবের নিজেরও খুব ইচ্ছে সেই বাড়িটা একবার দেখবেন। তাঁরা দুজন মৈত্রী এক্সপ্রেসে চড়েছেন এই স্বপ্ন নিয়ে। মুখোমুখি বসা দুই দম্পত্তির মুখ থেকে এসব কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল মৈত্রী এক্সপ্রেস আসলে এক স্বপ্নের রেলগাড়ি। কত মানুষের কত স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছে।

ট্রেনের স্পিড তখন বেড়েছে। দুপাশে সবুজ সোনালি শস্যের মাঠ, কোথাও কোথাও বনভূমি। উদাস অপার একখানা মাঠ পড়ে আছে কোথাও, গ্রাম মানুষের ঘরবাড়ি, রূপালি ফিতের যতো শান্- স্নিগ্ধ একটি নদী। জারুল ফুলে বেগুনী হয়ে আছে গাছ, কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া আর সোনালু ফুলের হলুদ বর্ণে বর্ণময় হয়ে আছে পথপাশের গৃহস্থবাড়ির আঙিনা। সবুজ মাঠের মাথায় পাশাপাশি উড়ছে লম্বা লেজঅলা দুটো সাপঘুড়ি। একটা কাটা পড়ে নিচে নামছে। খালি গায়ের এক বালক ছুটছে সেই ঘুড়ি ধরতে। এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে নিজের ছেলেবেলার অনেকখানি দেখতে পাই আমি। একজীবনে আমিও কি একদিন এইভাবে ছুটিনি কোনও কাটাঘুড়ির পেছনে!

বৈশাখ মাসের বাংলাদেশ কী যে সুন্দর। দয়ামায়াহীন রোদে পড়ে আছে সেই আদি অনাদিকালের গ্রামবাংলা। যেদিকে তাকাই চোখ জুড়িয়ে যায়। গ্রামের মাথার ওপর স্বচ্ছ নীল আকাশ। আকাশ এবং মাটির মাঝখানে চিরকালীন বিরহ। এই দেশটির দিকে তাকালে একটি লাইনই মনে আসে, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

রবীন্দ্রনাথের এই গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত।
একদা দুইবাংলার মানুষ একনাড়িতে বাঁধা ছিল। দুটো দেশ হয়ে যাওয়ার ফলে একবাংলার মানুষ চলে গেছে অন্যবাংলায়, অন্যবাংলার মানুষ চলে এসেছে আরেক বাংলায়। ধর্মের ব্যবধান তেমন কোনও দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি। একটি জায়গায় দুইবাংলার মানুষই এক জাতীসত্তা। আমরা বাঙালি জাতী এই পরিচয় দিতেই বাঙালি সব চাইতে বড় গৌরববোধ করে।

আমি নানাকাজে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াই। কত সুন্দর সুন্দর জায়গা যে আছে বাংলাদেশে! কক্সবাজার

সমুদ্র সৈকত, পৃথিবীর কোথাও এতটা দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত নেই। টেকনাফ থেকে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে ১২ কিলোমিটার দূরে প্রবালদ্বীপ সেন্টমার্টিন। বেড়াবার জন্য অসাধারণ জায়গা। সুন্দরবনের সৌন্দর্যের কথা সবাই জানে। পাবত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্-রে লেক আর পাহাড়ি নদীর দুইপাড়ে কত যে মনোরম দৃশ্য। বান্দারবান, চিম্বুকপাহাড়, সীতাকুণ্ডু, মহেশখালীর পাহাড়ে আদিনাথের মন্দির। ঢাকার লালবাগকেলা, দিনাজপুরের কান্-জীর মন্দির, সিলেট শ্রীমঙ্গলের নয়নাভিরাম চাবাগান, বাগেরহাটে ষাটগম্বুজ মসজিদ। আর বাংলাদেশে কত যে নদী। কী অসাধারণ নাম একেকটা নদীর। পদ্মা মেঘনা যমুনা আঁড়িয়ল খাঁ কপোতাক্ষ সুরমা। বরিশালের একটি নদীর নাম 'সন্ধ্যানদী'। জীবনানন্দের নদী 'ধানসিড়ি'। বিক্রমপুর এলাকার ছোট্ট এক নদীর নাম 'রজতরেখা'। নেত্রকোনার পাহাড়ি নদী 'সোমেশ্বরী'।

কিছুদিন আগে 'প্রথম আলো' পত্রিকার কাজে দিনাজপুরে গিয়েছিলাম। দিনাজপুর শহর তখনও অনেকটা দূর। বিকেল হয়ে আসছে। পশ্চিম দিককার মাঠের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে সূর্য। রাস্-ার দুপাশে দিগন্- বিস্তৃত সোনালি ধানের মাঠ। দিনশেষের সূর্যের আলোয় কী যে অপূর্ব দেখাচ্ছে। বহু বহুকাল এরকম দৃশ্য আমি দেখিনি। মাঠের ধারে গাড়ি থামিয়ে নেমে গেছি ধানী মাঠে। পেকে ওঠা ধানের স্নিগ্ধ ঘ্রাণে ভরে আছে চারদিক। মাঠের মাঝখান দিয়ে একা একা কিছুটা দূর হেঁটে যাই। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে আসে।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
বিষণ্ন আলোয় এই বাংলাদেশ
এ আমারই সাড়ে তিনহাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরি ছোঁয়াবো।
আমি বিষপান করে মরে যাবো।

[মূল কবিতার লাইনগুলো অন্যরকম ভাবে সাজানো। আমি আমার স্মৃতি থেকে নিজের মতো করে তুলে দিলাম]

নিজের এই সাড়ে তিনহাত ভূমির জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি। বাংলাদেশকে বুঝতে হলে '৭১ সালটিকে বুঝতে হবে, বাংলাদেশকে জানতে হলে '৭১ সালের মানুষদেরকে জানতে হবে।

একজন মায়ের কথা বলি। ছেলে মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকায় অপারেশান করতে এসে পাকিস্-ান আর্মীর হাতে ধরা পড়েছে। রমনা থানার কয়েদখানায় রাখা হয়েছে তাঁকে। খরব পেয়ে মা গেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ছেলে বলল, অনেকদিন ভাত খাইনি মা। কাল তুমি আমার জন্য ভাত নিয়ে এসো। পরদিন ভাত নিয়ে গেছেন মা। গিয়ে শোনেন তাঁর ছেলে সেখানে নেই। কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ছেলেকে কেউ জানে না। মায়ের সেই ছেলে আর কোনওদিন ফিরে আসেনি। ছেলে ভাত খেতে চেয়েছিল, মা তাঁকে খাওয়াতে পারেননি। সেদিন থেকে সেই মা আর কোনওদিনও ভাত খাননি। স্বাধীনতার পর চৌদ্দ বছর বেঁচে ছিলেন মা কিন্তু ভাত মুখে দেননি। এই মাকে নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন আনিসুল হক। তাঁর সেই উপন্যাসের নাম 'মা'। বাংলাদেশ হচ্ছে এই মায়েদের দেশ।

আমার কখনও কখনও মনে হয় বাংলাদেশ আসলে এক স্বপ্নের রেলগাড়ি। পনেরো কোটি মানুষ আমরা এই গাড়ি নিয়ে বহুদূর যেতে চাই। আমাদের স্বপ্নের কাছাকাছি।